বিজ্ঞানের ক্যানভাসে ভুলবোঝার কোলাজ

সৌম্যজিৎ রায়

''আধুনিক কবি, এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পী, বিরূপ প্রেমিক আর তোমার মধ্যে মিল কোথায় জানো?'' এমন অদ্ভুত প্রশ্নের মানে কিছু বুঝে ওঠার আগেই উত্তর আসে ''তোমাদের কারো সাথেই সহজে কমিউনিকেট করা যায় না। তোমাদের বোঝে সাধ্যি কার?'' ভুল বোঝার যুগ বুঝি এটা। বাবা ছেলেতে ভুলবোঝাবুঝি - জেনারেশন গ্যাপ! স্বামী-স্ত্রীতে কথাকাটাকাটি - কমিউনিকেশান গ্যাপ! অবশ্য এই বাবা-ছেলে-স্বামী-স্ত্রীর দলের যারা একটু কম্পিউটারের ঘনিষ্ঠ তাঁরাই হয়তো চাক্ষুষ করেছেন কমিউনিকেশান গ্যাপের আসল স্বরূপ। তা মানুষে-মানুষে নয়। মানুষে মেশিনে! কম্পিউটারের মত মেশিন সেদিনই হয়ত প্রকৃত ইন্টেলিজেন্ট হয়ে উঠবে যেদিন সে মাপা গাণিতিক ভাষার জড়তা ছেড়ে আমাদের রোজকার সহজ এলোমেলো কথাগুলো নিজের মত করে বুঝতে শিখবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ১+১=২ এর সহজ অঙ্ক নয়। তার থেকে অনেক বেশী কিছু। দুজোড়া চোখের না বলা কথায়, বৃষ্টিভেজা ঘাসফুল, গোলাপের গন্ধে যে জীবন ও জগৎ কথা বলে তাকে বোঝার অঙ্কটা বেশ কঠিণ। আর বিজ্ঞানী সেই রূপ-রস-গন্ধে ভরা জগৎটাকেই বুঝতে চান কিছু স্বতঃসিদ্ধ, যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধির লেন্সে। তাঁর দেখা উপলব্ধি বা জ্ঞানটুকু তিনি প্রকাশ করতে চান সাধারণ মানুষের সহজ প্রাণের ভাষায়। অথচ এই সেই ভাষা যার সীমাবদ্ধতায় বিরক্ত হয়ে হয়তো একদিন না একদিন আমরা প্রত্যেকেই অভিযোগ করেছি কমিউনিকেশান গ্যাপের। এই কমিউনিকেশান গ্যাপের শিকার কখনো বিজ্ঞানীও। কিন্তু এখানেও একটা ভুলবোঝাবুঝি দানা বাঁধে। ওঠে অভিযোগ। বিজ্ঞানী নাকি জনবিমুখ। সহজ কথায় সাধারণ মানুষকে নাকি তিনি বোঝাতে চান না তাঁর কাজ - তাঁর গবেষণা। উপদেশ আসে -*''Scientists will find it is worth making the effort to explain what they are doing to the public.''* কিন্তু কতটা সত্যি এই অভিযোগ? এর সঙ্গে পাশাপাশি এসে পড়ে আরো অনেক প্রশ্ন। বিজ্ঞানী কি আদৌ সহজ কথায় সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেন না তাঁর কাজ? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আরো কিছু অদেখা কারণ? আমরাই বা কতটা প্রস্তুত বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নিজেদের মত করে বুঝে নিতে? সুনিশ্চিত আশ্বস্ত জীবনের সাজানো সংসারে অভ্যস্ত আমাদের মন কি সহজে মেনে নিতে পারে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মত আধুনিক বিজ্ঞানের অনিশ্চিত দুনিয়া? একটা কিছুর অভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই অভাবটা কিসের? সেটা কি নিছকই বিজ্ঞানীর আগ্রহের? সম্যক দৃষ্টিভঙ্গীর? ভাষার? নাকি অন্য কিছুর? কেনই বা বিজ্ঞানের আলোচনায় সাধারণমানুষে-বিজ্ঞানীতে এমনকি বিজ্ঞানীতে-বিজ্ঞানীতেও হয় ভুলবোঝাবুঝি? কেনই বা আইনস্টাইন, পাউলি, পেরূজের মত বিজ্ঞানীরাও তাঁদের নিজেদের আবিষ্কার বেশ কিছুদিন লুকিয়ে রাখেন লোকচক্ষুর আড়ালে? এমনই নানান প্রশ্ন এই প্রবন্ধে। ভুলবোঝার কারণ খুঁজতে নয়, বরং আমরা এই প্রবন্ধে দৈনন্দিন জীবনের কমিউনিকেশান গ্যাপের পাশাপাশি বিজ্ঞানের জগতের কমিউনিকেশান গ্যাপের উদাহরণে বিজ্ঞানকে দেখার চেষ্টা করেছি রোজকার জীবনের মত করে। ভুলবোঝার নিশান খুঁজতে বেরিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি তার এক সুন্দর মানবিক রূপ। বিজ্ঞানের ফিতে মাপা অঙ্ক-কষা

দুনিয়াতেও তার সেই রূপ অটুট, সুন্দর। এই প্রবন্ধ কমিউনিকেশান গ্যাপের সেইসব টুকরো ছবিরই কোলাজ। আর কোলাজের শেষ কোনায় কমিউনিকেশান গ্যাপ মুক্ত কল্প-বিজ্ঞানের এক অঙ্ককষা, যান্ত্রিক দুনিয়ার ছবি। পাশে একটা ছোট্ট প্রশ্ন। কমিউনিকেশান গ্যাপ মুক্ত সেই অঙ্ককষা, যান্ত্রিক দুনিয়াই কি আমাদের কাম্য?

কোলাজ শেষ। ছবির রিলটা রিওয়াইন্ড করে ফিরে আসি গোড়ার কথায়।

তখন বিজ্ঞানের বয়ঃসন্ধি। উনিশ শতকের গোড়ার দিক। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আবিষ্কারে বদলে যাচ্ছে সব প্রচলিত ধ্যান-ধারণা। অনেকটা বিজ্ঞানের গোড়া ধরে যেন খুব জোরে নাড়া দিয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এতদিন ধারণা ছিল আলো একধরণের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তড়িৎক্ষেত্র আর চৌম্বকক্ষেত্রের আন্দোলন যেন হাত ধরাধরি করে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের জন্ম দেয়। আলো তেমনি এক তরঙ্গ। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের লেন্সে আলোর এই স্বরূপটাই গেল আমুল বদলে। সে কেবল তরঙ্গ নয়, কণা-তরঙ্গের সমন্বিত রূপ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে ভাবা যায় না। অনেকটা স্ত্রী আর মায়ের মাঝখানে পড়লে ছেলের যেমন অবস্থা হয় - সে কখনো মায়ের সুরে কখনো বৌ এর তালে কথা বলে - অথচ সে থাকে নিজেরই মতন। আলোও অনেকটা সেরকম। সে কখনো তরঙ্গ, কখনো ফোটণ নামের কণার স্রোত। পুরো ব্যাপারটাই বেশ গোলমেলে। কারণ আমাদের রোজকার জীবনে এমন অভিজ্ঞতায় আমরা অনভ্যস্ত। আসে এক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। হতে পারে ভুলবোঝাবুঝি।

সৌরভবাবুর সৌজন্যে আজ বাঙলার ঘরে ঘরে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। আমিও তাদেরই একজন (!) অথচ এক জার্মান বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল দেখতে বসে - ক্রিকেটের নোবল জিনিসটা কি - তা বোঝাতে গিয়ে আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল তা আর নাই বা বললাম! আমার বহু ব্যাখ্যা শুনে সে খুব উৎসাহিত হয়ে বলল "বুঝেছি, অনেকটা ফুটবলের হ্যান্ডবলের মত!" আসলে আমাদের স্বভাবজ প্রবণতা নতুন অভিজ্ঞতাকে চেনা-জানা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার। ফুটবলের হ্যান্ডবল কোনোভাবেই ক্রিকেটের নোবল নয়। তবু ফুটবল পাগল জার্মান বন্ধুর ক্রিকেটে অনভ্যস্ত মন নোবলকে সেভাবেই দেখতে বা বুঝতে চায়। কিন্তু খেলাটা যদি হয় সম্পুর্ণ অদেখা, অপরিচিত তখন বোঝার ব্যাপারটা আরো বেশী কষ্টকর। কারণ-অনভিজ্ঞতা। আর বিজ্ঞানীর কাজ যেন তেমনি এক জটিল খেলার ধারাভাষ্যকারের। সেই খেলাটা কোনো এক অজানা দেশে বসে খেলছেন বিশ্ববিধাতা। সেটা সৃষ্টির দাবা

খেলা। আর এখান সেখান থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এক-আধবার গিয়ে পৌঁছছেন সেই দেশে। সেখানে একটা আধটা দাবার চাল দেখেই প্রত্যেককে বিদায় নিতে হয়। তারপর বিজ্ঞানীকে বুঝতে ও বোঝাতে হয় ঠিক কি ছকে খেলতে বসেছেন বিশ্ববিধাতা! কিন্তু সেই চাল দেখিনি আমি, আপনি, এমনকি সেই আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ছাড়া অন্য কোনো বিশেষজ্ঞও। এবার সেই আবিষ্কারক আমাদের কাছে আমাদের চেনা অভিজ্ঞতায়, সহজ প্রাণের ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেন প্রকৃতির গোপন খেলার ছক। তাই আসে বোঝার সমস্যা। বোঝানোর সমস্যা। প্রকাশের সমস্যা তো বটেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে পরের ছোট্টো উদাহরণে।

একটা টেনিস-বলকে দড়িতে বেঁধে জোরে ঘোরালে তার প্রত্যেক মুহূর্তের অবস্থান নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অথচ কোনো বলের আয়তন যদি সেই টেনিস-বলের আয়তনের কোটিভাগের একভাগ বা তার কিছু বেশীও হয় তখন তার প্রতি মুহূর্তের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। এক ধরণের অনিশ্চয়তা দানা বাঁধে। অবস্থানের অনিশ্চয়তা। সময়ের অনিশ্চয়তা। টেনিস-বলের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা যেখানে বেশ কম, সেখানে ফোটণ জাতীয় কণায় এই অনিশ্চয়তা বেশ উল্লেখযোগ্য। ‘‘এখন এই ফোটণটির অবস্থান এখানে ’’ - ১৯২৫ এর পর থেকে এই কথাটা আর বলা যায় না। সৌজন্যে - কোয়াণ্টাম অনিশ্চয়তা। আমাদের রোজকার জীবনে এমন অনিশ্চয়তায় আমরা অনভ্যস্ত। যেমন, কেউ যদি এখন প্রশ্ন করেন যে আমি কোথায়? উত্তর করবো - কম্পিউটারের সামনে বসে। কম্পিউটারটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলবো ঘরের *ঠিক* মাঝখানে। সুনিশ্চিত, আশ্বস্ত এ উত্তর। কিন্তু কোয়াণ্টাল রাজ্যে এমন উত্তর অসম্ভব। তখন বলতে হয় - কম্পিউটারটা থাকার সম্ভাবনা অমুক অমুক অমুক জায়গায় অত ও তমুক তমুক তমুক জায়গায় তত। আর সেই জায়গাটা ঠিক মত বোঝাতে দরকার আরো কিছু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রাশিমালা! জানি উদাহরণটা ভালো হল না। হয়তো অনেকটা বিভ্রান্তিমুলক। তার কারণ কোয়াণ্টাল রাজ্যের কোনো উপমা বাস্তব দুনিয়ায় পাওয়া অসম্ভব। অথচ আমাদের ভাষা বাস্তবের ভাষা। এখানেই সমস্যায় পড়েন বিজ্ঞানী। তিনি বুঝতে পারেন ভাষার অপ্রতুলতা। কখনো ভাষার রাজ্য ছেড়ে তিনি আশ্রয় খোঁজেন গাণিতিক রাশিমালায়। মনে পড়ে পদার্থবিদ ফ্রাঙ্ক ভিলচেকের কথা, *“Ordinary language is [….] an unavoidable scientific tool – rich and powerful, but also quite imperfect.”* এ প্রসঙ্গে ভাষার *imperfection* বুঝতে আমরা এবার ভাষাজগতে একটা ছোট্ট উঁকি দিয়েই ক্ষান্ত হব।

ভাষাকে অনেকসময় তার শক্তি, বহুমুখীতা, নমনীয়তার জন্য হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভাষার শক্তি প্রকাশের স্বচ্ছলতায়। কবি, সাহিত্যিকের কথা বাদ দিয়ে যদি শুধু আমাদের রোজকার জীবনের কথা এক মুহূর্তের জন্য থেমে ভাবি তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না কিভাবে ছোটো ছোটো শব্দের ইঁটে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের মনের কথায় আবেগ, রাগ, অভিমানের ঘর ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে থাকি। আর যেকোনো ভাষার মুল লক্ষ্য - কমিউনিকেশান। সৌন্দর্য স্বয়ং-সংশ্লেষ। সহজ কথায়, সীমিত শব্দের অসীম ব্যবহারে সুন্দর আমাদের ভাষা। বিশ্বসাহিত্যের সব সৃষ্টিই দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সীমিত শব্দের পায়ে ভর রেখেই। এইসব শব্দের একক আবার কটা কম বেশী চিহ্ন, যাকে আমরা বলি অক্ষর। এখানে হয়তো একটু সতর্ক হলে আমরা ভাষার সঙ্গে জীবনের মিল খুঁজে পাবো। ভাষার মত জীবনও স্বয়ং-সংশ্লেষমুলক। একটা আকার-অবয়বহীন ব্যাক্টেরিয়া থেকে সুন্দর সামুদ্রিক শাঁখ, কি মানুষ, সবাই কোষের সমাহার। নানাভাবে নানান বিন্যাসে কোষ সাজিয়ে প্রকৃতি যে সৃষ্টির মিউজিয়াম সাজিয়েছে তা দেখলে অবাক লাগে। আর আমাদের ভাষা? আমরাও প্রকৃতির মত সীমিত শব্দের পুঁজি নিয়ে সাজিয়েছি আমাদের দুনিয়া। আমাদের শব্দ প্রকৃতির কোষের মত। কোষ যেমন জীবনের একক, ভাষার একক তেমনি শব্দ। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কোষ সাজিয়ে এসেছে জীবন। ভাষাও তেমনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সাজানো শব্দের প্যরেড। কোষ সাজানোর নিয়মের নড়চড় হলেই আসে ক্যান্সার - মৃত্যু। ভাষার মৃত্যুও তেমনি শব্দ সাজানোর ভুলে, কমিউনিকেশান গ্যাপের ক্যান্সারে। ব্যক্তিজীবন থেকে বিজ্ঞানজগৎ কমিউনিকেশান গ্যাপ সর্বত্র। কোনোভাবেই কি এড়ানো যায় না তাকে? নাকি ভাষা ছাড়াও আরো কিছু লুকিয়ে এই ভুলবোঝার বোঝায়?

ভাষার ভুমিকা অস্বীকার করি না। তবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ও তার কমিউনিকেশানে ভাষার চেয়েও বড় প্রতিবন্ধকতা আমাদের মনে। আবিষ্কারটা আমাদের অভিজ্ঞতার চেনা চৌহদ্দির বাইরে হলেই যত্ত গন্ডগোল। তখন তাকে মেনে নিতে, বুঝতে কি বোঝাতে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। ভাষার অভাবটা সেখানে মুখ্য নয়। আসল গিঁটটা আমাদের মনে। সাধারণ মানুষ থেকে বড় বিজ্ঞানী - আবিষ্কারের বিষয় বস্তু আমাদের চেনা কিছুর সঙ্গে না মিললেই অশান্তি। সব গোলমালের শুরু সেইখানেই। আসলে আমরা, অর্থাৎ আমি, আপণি, সাধারণ মানুষ থেকে বিজ্ঞানী, সবাই যেকোনো জিনিস বুঝি তার প্যাটার্ণ বা ধরণ দিয়ে। নতুন কিছু দেখে তার প্যাটাণর্কে চেষ্টা করি চেনা কিছুর প্যাটার্ণের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। করেন বিজ্ঞানীও। আর কমিউনিকেশান সেই প্যাটার্ণের প্রবাহ। তবে এখানে প্যাটার্ণ বলতে আমি ঠিক কি বোঝাতে চাই তা একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক!

আলপণা শব্দটা শুনলেই কি মনে পড়ে? স্কুলের সরস্বতী পুজো, পুরোনো কোনো বাড়ীর ঠাকুর দালান বা আমার বয়সী অনেকের মাধ্যমিকের ওয়ার্ক-এডুকেশানের খাতা! কি ধরা যাক বই। বই বলতে কি মনে হয়? মনে হয় বেশ কিছু পাতায় জমানো জানার জিনিস। আমরা কিন্তু বইয়ের সংজ্ঞা ভাবি না, ভাবি না অন্য কিছু। স্রেফ একটা ধারণা মনে উঠে আসে। শুরু হয় মিলিয়ে নিয়ে চিনে নেওয়ার খেলা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় কগনিশান। এখন যে জীবনে কোনোদিন আলপণা বা বই চোখেও দেখেনি তার কাছে এই দুটো শব্দই সমান ভাবে অর্থহীন। শব্দ দুটো বোঝাতে প্রয়োজন তাকে বই বা আলপণা আলাদা করে দেখিয়ে, চিনিয়ে দেওয়া। বই বা আলপণা, আমাদের চারপাশের জগতে এ দুটোরই সহজে দেখা মেলে। কিন্তু যদি কোনো শব্দ বা ধারণার অস্তিত্ব আমাদের চারপাশের দুনিয়ায় না থাকে তখন সমাস্যাটা বাড়ে। বিজ্ঞানের অনেক ধারণাই এরককম। আমাদের অচেনা। চারপাশের বস্তুজগতে তাদের অস্তিত্ব নেই। তাই আসে বোঝার বা প্রকাশের সমস্যা। আশ্রয় নিতে হয় নতুন শব্দ বা উপমার। অবশ্য কবি, সাহিত্যিক আর প্রেমপত্রের সঙ্গে উপমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার দুর্নাম থাকলেও, বিজ্ঞানের দিনরাতের আড্ডাতেও তার আসা-যাওয়া কিছু কম নয়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে আসছে। ১৬৬৬। বলা যায় বিজ্ঞানের শৈশব। তখন প্রচন্ড প্রবণতা সুন্দর উপমার আশ্রয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ বা প্রকাশের। উপমার উপদ্রবে (?) উত্যক্ত হয়ে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য স্যামুয়েল পার্কার তা বন্ধ করতে এক প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে ছিল, "*….wanton and luxuriant fancies climbing up into the bed of Reason, do not defile it by unchaste and illegitimate Embraces, but instead of real conceptions and notices of things impregnate the mind with nothing but Ayerie and Subventateous Phantasmes."* সেই থেকে এই প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলেননি কেউ। বিজ্ঞানের ভাষাকে নিরাভরণ করতে চেয়েছিলেন পার্কার। পারেননি। তা করতে গিয়ে নিজেই অজান্তে উপমার আশ্রয় নিয়ে বসেন। সেই ভাষা আজো অনেকটাই উপমা নির্ভর। বিজ্ঞানের স্বার্থেই। এখন উপমার কথা সরিয়ে ফিরে যাই আবার প্যাটার্ণের প্রবাহে।

বাঁ দিকের ছবিতে দুটো
প্যাঁচানো সাপের সিঁড়ির
মত ডিএনএ।
ডানদিকের ছবিতে হিমোগ্লোবিনের
'অসুন্দর' আসল রূপ।
(ছবি দুটো এক স্কেলে নয়)

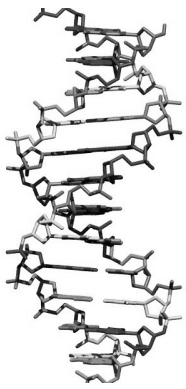

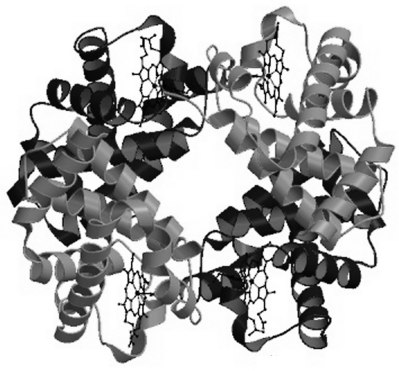

বিজ্ঞানে কোনো নতুন আবিষ্কার - আবিষ্কারক থেকে অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছয় কমপক্ষে - চারটে ধাপ পেরিয়ে। আর প্রত্যেক ধাপেই থাকে ভুলবোঝার সম্ভাবনা। ঠিক একই ঘটনা ঘটে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, যখন দুজন মানুষ কোনো বিষয়ে কথা বলেন। সেখানেও সেই চারটে পর্যায়। প্রত্যেক পর্যায়ে ভুলবোঝার সম্ভাবনা। কি কি সেই পর্যায়? কোথায় কোথায় ভুলবোঝার সম্ভাবনা - এবার তার কথা। ধরি দুই বন্ধু নবীন ও প্রবীণ। এও ধরা যাক, এদের দুজনেই শাঁখ দেখে থাকলেও কেউই শামুক দেখেনি কখনো। এখন নবীন একদিন একা বেড়াতে গিয়ে একটা শামুক দেখে দারুণ উত্তেজিত! এবার সে নিজেকে বোঝালো সে ঠিক কি দেখেছে : একটা কিছু যা *শাঁখের মত* দেখতে, খুব আস্তে আস্তে চলতেও পারে। অর্থাৎ সে শামুককে শাঁখের সঙ্গে সম্পর্কিত করল। শুধু নবীনই কেন আমরাও তাই করি। নতুন কিছু দেখে আমরাও চেষ্টা করি তাকে চেনা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। করেন বিজ্ঞানীও। নতুন কোনো আবিষ্কারকে তিনি মিলিয়ে নিতে চান পুরোনো বা চেনা কিছুর সঙ্গে। এটা আমাদের স্বভাবগত। নতুন কিছুকে পুরোনো কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে চিনে নেওয়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায় *cognitive isomorphism.* নবীন যা চিনল তা নিছক শামুক না বরং একটা ধরণ বা প্যাটার্ণ যাকে সে তার মনে জমে থাকা শাঁখের প্যাটার্ণের সঙ্গে তুলনা করে প্রথমে চিনতে ও পরে বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝাতেই তার কাজ ফুরোয় না। আসে বোঝানোর পালা। তার লক্ষ্য প্রবীনকে সে কি দেখেছে তা বোঝানো। সেটা তৃতীয় ধাপ। কিন্তু প্রথম দুটো ধাপেই কি কম ভুল করার অবকাশ? যেমন নবীন যদি কালচে কোনো শামুক দেখে ভাবে যে শামুক সবসময় কালচেই হয়, তখনো বিপত্তি! কাজেই নবীনের দেখার ওপরও যে তার বোঝা বা ভুলবোঝা অনেকটা নির্ভর করে তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো বিজ্ঞানী যখন নতুন কিছু আবিষ্কার করেন তিনি প্রথমেই তাকে তাঁর চেনা কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বুঝতে চান। আবিষ্কার একদম অন্যরকম কি অচেনা হলে তাকে মেনে নিতে সময় লাগে। শুরু হয় নিজের মনের সঙ্গে লড়াই। বুঝতে তাই খুব অসুবিধে হয় না কেন কোয়ান্টাল রাজ্যের অনিশ্চয়তার আবিষ্কার আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও সহজে মেনে নিতে পারেননি। আমাদেরই মতন এমন অনিশ্চয়তায় তিনিও ছিলেন অনভ্যস্ত। প্রসঙ্গতঃ আরো একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে। উনিশ শতক। ৫০ এর দশক। জীববিদ্যায় চূড়ান্ত আবিষ্কারে অভিভূত বিজ্ঞান জগৎ। জীবনের একক কোষ। কোষের শব্দকোষ ডিএনএ। দুটো প্যাঁচানো সাপের মত সিঁড়ির মাঝে মাঝে জীবনের লুকোনো চারটে কোড - অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন - বিভিন্ন বিন্যাসে সাজানো। প্রকৃতির মৌলিক স্বরলিপি। আবিষ্কারক রোসালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক। ওয়াটসন ও ক্রিক পেলেন নোবেল প্রাইজ। দারুণ ব্যাপার। আর ডিএনএ-র এমন সাজানো সুন্দর গঠন দেখে বিজ্ঞান মহলে ধারণা হল, প্রকৃতির সমস্ত মৌলিক গঠণই হবে সুন্দর। কোনো কারণ নেই তেমন ধারণার তবু সবার গভীর বিশ্বাস। এও মানুষের মনের এক দুর্বলতা, চেনা কিছুর বাঁধনে আষ্টেপৃষ্টে আটকে পড়া। মনে হতেই পারে এমন দুর্বলতায় ক্ষতি কি? কিন্তু

ক্ষতি হতে পারত। এক যুবক বিজ্ঞানী ম্যাক্স পেরূজ তখন আমাদের রক্তের হিমোগ্লোবিন কিভাবে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শরীরের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেয় তার রহস্য খুঁজতে ব্যস্ত। অনেক কান্ড করে তিনি দেখতেও পেলেন হিমোগ্লোবিনের আসল রূপ। কিন্তু একি? ডিএনএ অত সুন্দর আর হিমোগ্লোবিন এত কদর্য! অপ্রত্যাশিত পর্যবেক্ষণ। কারণ? চেনা পুরোনো ধারণার প্রতি গভীর মানবীয় মমতাবোধ। ক্ষুব্ধ পেরূজ ভাবলেন নিশ্চই কোথাও ভুল হয়েছে। তাঁর মন হিমোগ্লোবিনের যে সুন্দর ছবি এঁকেছে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তাঁর মন সেদিন সেই আবিষ্কারে তাই সায় দেয়নি। অনেকটা একইভাবে পদার্থবিদ ওলফগাঙ্গ পাউলি প্রথম নিউট্রিনোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেও তা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ঘটনাটা বেশ মজার। পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি আর ভরবেগ সংরক্ষণের নিয়ম আমরা অনেকেই জানি। ভরবেগ হল কোনো জিনিসের ভর আর বেগের গুণফল। সংরক্ষণের সেই নিয়ম অনুযায়ী, প্রকৃতির যেকোনো প্রক্রিয়ায়, শুরুর আর শেষের মোট শক্তি আর ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে। এ যেন অনেকটা প্রকৃতির রোজকার হিসেব রাখার খেলা। এতটুকু নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু ১৯৩১ নাগাদ হাতে-কলমে পাউলি প্রকৃতির এই হিসেব মেলাতে বসেন। নিউট্রন ভেঙে প্রোটন আর ইলেকট্রন হওয়ার সময় এই হিসেবটা মেলে না। প্রকৃতির সংরক্ষণ সুত্রের ওপর গভীর বিশ্বাস থেকে তিনি বুঝতে পারেন, ছোট্টো কিছু একটা যেন হিসেবের নাগাল পেরিয়ে যাচ্ছে। আসলে তাই ছিলো অ্যান্টিনিউট্রিনো। কিন্তু তাদের দেখা সরাসরি মেলে না। আর তাই সেই ছোট্টো চার্জশূণ্য অথচ যুগান্তকারী এই কণার আবিষ্কার মেনে নিতে না পেরে পাউলি কোনো বন্ধুকে এক চিঠিতে লেখেন, *"I have committed the ultimate sin, I have predicted the existence of a particle that can never be observed."* এর ঠিক তিন বছর পর ১৯৩৪ সালে তরুণ ইটালীয় পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি পাউলির খোঁজ পাওয়া সেই ছোট্ট কণার অস্তিত্ব নতুন তত্ত্বের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন ফেলে দেন। নাম দেন নিউট্রিনো। অর্থ, ছোট্ট নিস্তড়িত কণা। কেন বললাম এত কথা? কেন এত উদাহরণ? আসলে প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনে সংঘাত চলে। চাওয়া না চাওয়ার সংঘাত। আমরা শুধু তাই-ই দেখার চেষ্টা করি যা দেখতে চাই। বিজ্ঞানীও আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু বিজ্ঞান? তার তো বাস্তব নিয়ে কারবার। সে বারবার আমাদের এনে দাঁড় করায় বাস্তবের সামনে। কখনো সে বাস্তব কঠিন, অপ্রত্যাশিত। সেই বাস্তবকে মন থেকে মানতে না পেরে থমকে যান পাউলির মত বড়-মাপের বিজ্ঞানীও। মনের সায় না পেয়ে পেরূজও বেশ কিছুদিন লুকিয়ে রাখেন হিমোগ্লোবিনের আপাত অসুন্দর স্বরূপ। পাউলির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন তরুণ ফার্মি। সময়ের সঙ্গে মনের দ্বিধা নিজেই অতিক্রম করেন পেরূজ। হিমোগ্লোবিনের আসল স্বরূপ মেনে নিয়ে ব্যাখ্যা করেন আমাদের শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ। বিজ্ঞানের প্রবাহ কখনো থমকে গেলেও থেমে যায় না। নতুন আবিষ্কার আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর অন্তর্জগতের সব সংশয়, ভুলবোঝাবুঝির সংঘাত পেরিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর মনের বাইরের স্তরে জমাট বাঁধে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কারকে নিজে বুঝে আস্তে আস্তে অন্যদের বোঝানোর মত করে তোলেন। সেই আবিষ্কারের নতুন জ্ঞানের প্যাটার্ণ তাঁর অন্তর্জগতের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছয় মনের বাইরের স্তরে। এর পরে আসে তৃতীয় পর্ব - সায়েন্টিফিক কমিউনিকেশান।

আমরা কমিউনিকেশানকে বলেছি এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে প্যাটার্ণের প্রবাহ। প্রবাহের মাধ্যম ভাষা, শব্দ, চিহ্ন, ইত্যাদি। প্রসঙ্গ যখন সায়েন্টিফিক কমিউনিকেশানের, তখন প্যাটার্ণের প্রবাহের উৎস - আবিষ্কারক বিজ্ঞানী। মোহনা - বিজ্ঞানে উৎসাহী মহল। আর আমরা আগে এও বলেছি কোনো কিছু বোঝার ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত এক প্রবণতা তাকে চেনা জানা কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করা। তাই ভালো মাস্টারমশাই বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্ব ছাত্রদের খুব সহজ করে বোঝাতে রোজকার জীবন থেকে বেছে নেন ছোট-বড় নানান উদাহরণ। ঠিক একই কারণে আমরাও আমাদের রোজকার কথায় এটা-ওটার তুলনা টেনে আনি। অনেকসময় নিজেদের অজান্তেই। যেমন অমুককে দেখতে তমুকের মত। এটা দেখতে ওটার মত। কিংবা নবীন যখন প্রবীনকে বলে ‘‘একটা দারুণ জিনিস দেখলাম জানিস, দেখতে অনেকটা শাঁখের মত আবার নড়ে-চড়েও!’’ এখন মনে হতেই পারে, সবই তো ভালো কিন্তু এর সঙ্গে বিজ্ঞানী-সাধারণমানুষ কি বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে ভুলবোঝার সম্পর্ক কি? আসলে বক্তা বা শ্রোতা যখন কৃষ্টিগতভাবে আলাদা অর্থাৎ বিভিন্ন কালচারের মানুষ তখন তাদের চেনা জানা জিনিসের জগতটাও হয় বেশ আলাদা। আর তাই তাঁরা যখন এক টেবিলে কোনো বিষয়ে কথা বলেন সম্ভাবনা থাকে কমিউনেকেশানাল অ্যাসিমেট্রির। হতে পারে ভুলবোঝাবুঝি। কারণ তাঁদের জগৎ আলাদা। আলাদা তাঁদের ভাষাও। অন্য জগৎ, অন্য ভাষার ভুমিকাটা এখানে স্পষ্ট হবে একটা ছোট্টো বাক্যে। ধরা যাক বাক্যটা - আমি ভাত খাই। ইংরিজিতে এই বাক্যের শব্দগুলোর জায়গা না বদলে সরাসরি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় *‘I rice eat’,* যার কোনো মানে হয় না। কারণ দুটো আলাদা ভাষা। তাদের শব্দ সাজানোর নিয়মও আলাদা। বিজ্ঞানীর ভাষা আর সাধারণ মানুষের ভাষাও বেশ আলাদা। আলাদা তাদের কৃষ্টি। এমনকি এই তফাৎ বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। আর এই পার্থক্যের জন্যই হতে পারে ভুলবোঝাবুঝি। তেমন ভুলবোঝাবুঝিরই তিনটে নমুনা তুলে দিলাম বিজ্ঞানের বাগান থেকে।

টানেল এই ইংরিজি শব্দটা শুনলে কি মনে হয়? সুড়ঙ্গ। এখন যদি বলি ইলেক্ট্রনের টানেলিং, কিসের ছবি ভেসে ওঠে? বা যদি বলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইলেক্ট্রনের টানেলিং এর সম্ভাবনা x - তো মনে হতেই পারে যে সেই দুই জায়গার মধ্যে রয়েছে কোনো সুড়ঙ্গ - ইলেক্ট্রন সেই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করবে কিনা তার সম্ভাবনাই x. কিন্তু এমন ধারণা সম্পুর্ণ ভুল। পদার্থবিজ্ঞানীরা ইলেক্ট্রনের টানেলিং বলতে যা বোঝাতে চান তা

অনেকটা এরকম। দুটো জায়গা। মাঝে একটা বিশাল শক্তির দেওয়াল। আর সেই বিশাল উঁচু দেওয়াল সত্ত্বেও ইলেক্ট্রনের এ পার থেকে ওপারে যাওয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট সম্ভাবনা আছে। পাহাড় না টপকে ইলেক্ট্রনের এপার থেকে ওপারে যাওয়ার নামই টানেলিং। আর সেই সম্ভাবনা টানেলিং প্রব্যাবিলিটি x. টানেলিং এর উপমাটা সুন্দর। তবু ভুলবোঝার অবকাশও এতে কিছু কম না। কারণ উপমা নয়, বরং কৃষ্টির তফাৎ। এবার দ্বিতীয় উদাহরণ। গণিতে এক সুন্দর ধারণা আইসোমরফিসম। শব্দটার মাধ্যমে গণিতজ্ঞরা এক সুন্দর রূপান্তরের কথা বোঝাতে চান। অঙ্কের কচকচি এড়িয়ে এক বাক্যে আইসোমরফিসমকে বলা যায় *'information preserving transformation'*. এই শব্দটাকে আমরা আগেও ব্যবহার করেছি - কোনো কিছুকে মিলিয়ে চিনে নেওয়ার প্রসঙ্গে। গণিতজ্ঞদের কাছে এই আইসোমরফিসম বড় আদরের জিনিস। তাঁরা যেকোনো দুটো স্ট্রাকচারের মাঝেই খুঁজতে চান এক সাযুজ্য, মিল, বা আইসোমরফিসম। আমাদের মনের কম্পিউটারেও যে গণিতজ্ঞ বসে তিনিও কিন্তু নতুন কিছুর প্যাটার্ণ তাঁর হার্ড-ডিস্কে জমানো পুরোনো প্যাটার্ণের সঙ্গে মিলিয়ে সেই নতুন কিছুর মানে বুঝে থাকেন। এই চিনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের মগজের কম্পিউটারে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে আমরা তা উপলব্ধিই করতে পারি না! যাইহোক, কেমিস্টরাও কিন্তু আইসোমরফিসম শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অন্য ***অর্থে***(!) তাঁদের মতে যখন দুটো রাসায়নিক যৌগের, যেমন সোডিয়াম নাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট, ক্রিস্টালের গঠণ একই ধরণের হয় আর তারা মিলে মিশে মিক্সড ক্রিস্টাল তৈরী করতে পারে, তখনই তারা আইসোমরফাস। ক্রিস্টালের গঠণ বলতে বোঝায় সোডিয়াম/নাইট্রেট বা ক্যালসিয়াম/সালফেট আয়নগুলো থরে থরে কিভাবে ক্রিস্টালের ইঁটের মত এককে (বিজ্ঞানের পরিভাষায় যা 'ইউনিট সেল') সাজানো থাকে। ক্রিস্টাল নিয়েই এ প্রসঙ্গে আমাদের শেষ উদাহরণ। স্প্যানিশে ক্রিস্টাল শব্দের অর্থ কাঁচ। সাধারণ মানুষের চোখে ক্রিস্টাল খুব দামী কাঁচের আসবাব। অথচ ক্রিস্টালোগ্রাফারের চোখে, ক্রিস্টাল পদার্থের সেই অবস্থা যেখানে পদার্থের সাংগঠণিক অণু, পরমাণু বা আয়নগুলো সুদুরবিস্তারী নিয়মে সাজানো; শো-কেশের সৌখিন বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় *'long range order'*. কাঁচের তেমন কোনো অর্ডার নেই। ক্রিস্টালোগ্রাফারের চোখে কাঁচ তাই ক্রিস্টাল নয়। ক্রিস্টালোগ্রাফার সেইসব বিজ্ঞানী যাদের কারবার শুধু ক্রিস্টাল নিয়ে।

ক্রিস্টাল-গেজিং থামিয়ে ফিরে আসি ভুলবোঝার অলি-গলিতে। ঠিক কোনখানে দাঁড়িয়ে আমরা? আমরা দেখেছি বক্তা আর শ্রোতা, কি বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানমহলের মধ্যে যেকোনো কমিউনিকেশানের চারটে পর্ব। প্রত্যেক পর্বেই থাকে ভুলবোঝার অবকাশ। আমরা এও দেখেছি বৈজ্ঞানিক কমিউনিকেশানে কখন, কোথায়, কিভাবে এই চারটে ঢেউয়ে ভেসে আসতে পারে ভুলবোঝার ফেঁসো। বৈজ্ঞানিক কমিউনিকেশানের ক্ষেত্রে পর্যায় চারটে

অনেকটা এরকম। প্রথমত, আবিষ্কারকের নতুন আবিষ্কারের সম্পুর্ণ বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, বিশ্লিষ্ট তথ্যকে বারবার নাড়িয়ে-চাড়িয়ে যাচাই করে (ও মনোজগতের সম্মতি নিয়ে) আত্মপ্রতীতি অর্জন। তৃতীয়ত, আবিষ্কৃত তথ্য বা সত্যকে অন্য বিজ্ঞানী ও উৎসাহী-মহলের বোঝার মত করে প্রকাশ করা বা সায়েন্টিফিক কমিউনিকেশান। এরপর যা বাকী থাকে তা আমাদের বোঝার পর্ব। সেখানেও একই ভাবে প্রথমে আসে জিনিসটাকে নিজের মত করে চিনে বিশ্লেষণ করে নেওয়া। পরে তাকে নিজের করে নেওয়া। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কৃষ্টি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাষার গুরুত্ব অশেষ। যেমন আমার কাছে যা অবশ্যম্ভাবী আপনার কাছে তা নাও হতে পারে বা উল্টোটাও। তবে দুপক্ষের সতর্কতায় এইসব ভাষা, কৃষ্টি ও ব্যক্তিগত ব্যবধান অতিক্রম করে পারস্পরিক ভুলবোঝাবুঝি যে অনেকটাই এড়ানো যায় তা বলাই বাহুল্য। আর তার প্রমাণ, আমাদের আজকের লাইফ-স্টাইল। এর অনেকটাই ইন্টার-ডিসিপ্লিনারী রিসার্চের ফসল। এই ধরণের রিসার্চের মুল কথাই যে ভাষা, কৃষ্টি ও ব্যক্তিগত ব্যবধান অতিক্রম করে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, তা আজ আমাদের কারোর অজানা নয়।

এতসব সত্ত্বেও রোজকার জীবনের লেন্সে বিজ্ঞানে কোনো কিছু বুঝে নেওয়া বলতে যেন একটা অন্য ছবি ভেসে ওঠে। মনে হয় বিজ্ঞানের যেকোনো ঘটনার ব্যাখ্যাই যেন একটা বিচ্ছু বহুরূপী। তা আসলে সুক্ষ্মতর কোনো ঘটনার বর্ণণা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রশ্নে তার আগের স্বরূপটা যায় বদলে। নতুন প্রশ্নে উঠে আসে নতুন আরেক সেট ব্যাখ্যা, যারা আসলে লুকিয়ে রেখেছে আরো একসেট নতুন প্রশ্নের মোড়কে আরেক সেট নতুন সুক্ষ্মতর ব্যাখ্যার ভবিষ্যত প্রজন্ম। যেমন - বৃষ্টি হয় কেন? বিজ্ঞান প্রথমে এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে মেঘের জন্য। মেঘের বাষ্পকণাগুলো ঘনীভুত হয়ে ছোট্ট জলকণা তৈরী করে। অসংখ্য ছোট্ট জলকণা ঘনীভুত হয়ে তৈরী হয় বড় জলকণা। তাদের ঘনত্ব বাতাসের চেয়ে বেড়ে গেলে তা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, আহা! এই যাকে এতদিন ব্যাখ্যা বলে মেনে এসেছি তা তো আসলে আরো পাঁচটা ঘটনার বর্ণণা মাত্র! কারণ - মেঘে বাষ্পকণা ঘনীভুত হওয়া; ছোট জলকণার বড় জলকণায় রূপান্তরিত হওয়া; ইত্যাদি - এসবই তো নানান ছোট ছোট ঘটনার বর্ণণা, নয় কি? আর এই কথাটা বোঝা মাত্রই এই সমস্ত ঘটনার পেছনে ‘কেন’ জুড়ে দিলে বিজ্ঞান আবার কিছুকাল বাদে ফিরে আসে আরো এক রাশি ব্যাখ্যার ট্রে হাতে। সেইসব ব্যাখ্যাও আবার কতকগুলো ঘটনার বিবরণ। যত সময় যায় তত এই ছোট ছোট ‘কেন’র সংখ্যা বাড়তে থাকে। ধাপে ধাপে বিজ্ঞান ও তত নেমে যায় গভীর থেকে গভীরতর সুত্রে। সেই হিসেবে বিজ্ঞানে বোঝার ব্যাপারটাও বেশ আপেক্ষিক। সময় নির্ভর। আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে এখানেই বিজ্ঞানের পার্থক্য। সেখানে নেই একরাশ ‘কেন’ র সমারোহ। আর রোজকার জীবনের লেন্সে বিজ্ঞানের এই অসম্পুর্ণ ছবিটা বিজ্ঞানীদের কাছে অস্বস্তির

আর বিজ্ঞানের প্রগতির কারণ। এসব সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের রোজকার জীবনের একটা অঙ্গ। আমাদের ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্নের আশ্রয়। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই আমাদের এই 'কুড়িয়ে আনা ছড়িয়ে ফেলা'র সংসার। আর তাই মনে তো হতেই পারে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ভুলবোঝাবুঝির কারণ কি ব্যাখ্যা করা যায় না? বানানো যায় না কি ভুলবোঝাবুঝি শূণ্য এক দুনিয়া? এ প্রসঙ্গে আসে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সচেতনতার উদ্বর্তনের কথা। প্রশ্ন ওঠে: কখন একতাল জৈব পদার্থ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে? হাজার কোটি বা তার বেশী নিউরনে আঁকা মানুষের মাথায় কিভাবে আসে আত্মসচেতনতার প্রশ্ন? অত কোটি নিউরনের জটিল জৈব-রাসায়ণিক সার্কিটের সব খুঁটিনাটি না বুঝে তার কাজের নিয়মনীতিটুকু বুঝে নিয়ে বানানো যায় না কি মানুষের মত চৌখস মেশিন? এক তাল রক্ত-মাংস। অসংখ্য নিউরন। আর তার মধ্যে প্রচন্ড শক্তিশালী প্যাটার্ণ চেনার এক দুর্দান্ত ব্লুপ্রিন্ট। আমাদের মস্তিষ্ক। অজস্র নিউরন, সাইন্যাপ্সের এই হার্ড-ডিস্কে লুকিয়ে মানুষের অস্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মানবিকতা। বাখ, মোৎসার্ট, বীঠোফেনের সুর; রামানুজন, গ্যোডেলের গাণিতিক প্রতিভা; আইনস্টাইন, নিউটনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী; রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়রের ভাষার ইন্দ্রজাল - সবই এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মস্তিষ্কের আশ্রয়ে। নানান প্যাটার্ণ হয়ে। আমাদের প্রতিভা, অনুভব, আবেগ, সবই আমাদের মাথার ভেতরের কিছু জৈব-রাসায়ণিক সার্কিটের প্যাটার্ণ। মনে হতে পারে সেই প্যাটার্ণকে বুঝে তাকে ঠিকমত কাজে লাগালে তৈরী করা যায় মানুষের মত মেশিন বা মেশিনের মত মানুষ। এও মনে হতে পারে সেরকম দিন এলে থাকবে না আর কোনো ভুলবোঝাবুঝি। সব কিছু হবে ঠিকঠাক। পারফেক্ট। কিন্তু তেমন ভাবনাও একটা মস্ত ভুলবোঝা নয় কি? এ যেন ভবিষ্যতকে ভুলবোঝা। সেই দুনিয়ায় আজকের মত এসব ভুলবোঝাবুঝি থাকুক কি না থাকুক, সেখানে থাকবে না কোনো মানুষ। সেখানে অনুভব, ভালোলাগা, ভালোবাসা, দুঃখ, সুখ, প্রতিভা, কৃষ্টি সবই হবে যান্ত্রিক, কৃত্রিম। মাপা ও 'ম্যাপড'। তখন আর ''মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ'' করা নয়, বরং মস্তিষ্কের অমুক জোনের তমুক প্যাটার্ন ম্যাপিং রিজিওনে প্রয়োজন π পিকোমোল দুঃখনাশিনী হর্মোন। যেন অ্যাল্ডাস হাক্সলীর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'! *Homo machinus* দের মিউজিয়ামে সেদিন ঘুমিয়ে থাকবে *Homo sapiens*- রা। তেমন ভুলবোঝাবুঝি শূণ্য, যান্ত্রিক, অঙ্ক-কষা, মানুষ-মেশিনের জঙ্গলই কি আমাদের কাম্য?

ভুলবোঝাবুঝি বোঝার ঝোঁকে যেন পথ না হারাই আমরা। না হয় বেঁচেই রইলো ভুলবোঝাবুঝি, মান-অভিমান, সুখ-দুঃখর, মত মানবিক অনুভবগুলো অনাবিষ্কৃত রহস্যের মুগ্ধতায়। নাই বা পেলাম মনের ছোটোখাটো হাল্কা প্রশ্নের উত্তরগুলো। নাই বা বুঝলাম খেয়ালখুশির মেঘ-রোদ্দুর রক্ত-মাংস-হর্মোনের বৈজ্ঞানিক সার্কিটের প্যাটার্ণে। না হয় অজানাই রইলো কি করে খুব প্রিয়জনের রাগতঃ অভিযোগ মিনিটের কাঁটার সামান্য নড়াচড়ায় বদলে

যায় আদরের ‘কমপ্লিমেন্টে’। ‘‘লেখক, ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পী, প্রাণের বন্ধু আর তোর মধ্যে মিল কোথায় জানিস?’’ অদ্ভুত সেই প্রশ্নের মানে কিছু বুঝে ওঠার আগেই উত্তর আসে ‘‘তোরা খুব সহজে দারুণ কমিউনিকেট করিস। তোদের না বোঝে সাধ্যি কার!’’ একই মানুষ। সামান্য কিছু মুহূর্তে কেমন বদলে গেছে। কেন? কিভাবে? প্রশ্নগুলো না হয় বিজ্ঞানের ভাষায়, নিঁখুত করে, অঙ্ক কষে নাই বা বুঝলাম। ক্ষতি কি!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখাটা পড়ে গঠণমুলক সমালোচনার জন্য জার্মানীর বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সৌমেন দত্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রণিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র

1. a) S. Pinker, *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*, Penguin, London, **1994**.

   b) S. Pinker, *How the Mind Works*, W. W. Norton & Co., New York, **1999**.

   c) S. Pinker, *Words and Rules: The Ingredients of Language*, Basic Books, New York, **1999**.

   d) R. Jackendoff, *Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution,* Oxford University Press, New York, **2002**.

2. E. J. Tait, *Nature*, *417*, 221, **2002**.

2. D. R. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*, Basic Books, New York, **1999**.

3. a) N. Chomsky, *Language and Mind*, Hartcourt Brace Jovanovich, New York, **1972**.

b) N. Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, **1965**.

c) N. Chomsky, *Reflections on Language*, Pantheon, New York, **1975**.

d) M. D. Hauser, N. Chomsky, W. T. Fitch, *Science*, *298*, 1569, **2002**.

4. a) M. A. Nowak, J. B. Plotkin and V. A. A. Jansen, *Nature*, *404*, 495, **2000**.

b) M. A. Nowak, N. L. Kamarova, P. Niyogi, *Science*, *291*, 114, **2001**.

c) M. A. Nowak, N. L. Kamarova, P. Niyogi, *Nature*, *417*, 611, **2002**.

d) M. A. Nowak, D. C. Krakauer, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, *96*, 8028, **1999**.

5. a) M. Tomasello, *The Cultural Origins of Human Cognition*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, **1999**.

b) M. Tomasello, *Nature*, *417*, 791, **2002**.

6. a) F. Wilczek, *Nature*, *291*, 114, **2001**.

b) F. Wiczek and B. Devin, *Longing for the Harmonics,* W. W. Norton & Co., New York, **1988**.

7. J. –M. Lehn, *Supramolecular Chemistry: Concepts and Principles,* VCH, Weinheim, **1995**.

8. a) G. R. Desiraju, *Nature*, *423*, 485, **2003**.

b) G. R. Desiraju, *Crystal Engineering: The Design of Organic Solids,* Elsevier, Amsterdam, **1989**.

9. a) B. Maddox, *Rosalind Franklin: Dark Lady of DNA,* Harper Collins, London, New York, **2002**.

b) J. D. Watson, *The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA,* Penguin, London, **1999**.

c) J. D. Watson, F. H. C. Crick, *Nature*, *171*, 737, **1953**.

10. *The Terms of Reference of Commission on Aperiodic Crystals, International Union of Crystallography,* http://www.iucr.org/iucr-top/comm/capd/index.html

11. D. Draaisma, *Nature*, *414*, 153, **2003**.

12. a) D. Tannen, *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*, Balantine, New York, **1991**.

b) D. Tannen, *That's not what I meant! How conversational Style Makes or Breaks Your Relations with others*, Virago, London, **1992**.

c) D. Sperber, D. Wilson, *Relevance: Communication and Cognition,* Blackwell, Oxford, **1986**.

d) J. B. Pride, *Cross-cultural Encounters: Communication and Miscommunication,* River Seine, Melbourne, **1985**.

13. a) E. Wiegand, *Journal of Pragmatics*, *31*, 763, **1999**.

b) E. Wiegand, *Journal of Pragmatics*, *20*, 253, **1993**.

14. D. Zaefferer, *Journal of Pragmatics*, *1*, 329, **1977**.